ড. মোঃ আবদুল মোত্তালিব

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন জরুরি

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা— আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে সেই শিক্ষাকে বোঝায়, যা নিরক্ষর ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু, কিশোর ও বয়স্ক লোকদের সুবিধাজনক সময়ে সাক্ষর জ্ঞান দেয়া হয়। সাক্ষরতা বলতে Reading, Writing Counting and Functioning বোঝায় অর্থাৎ পড়া, লেখা, গণনা ও কার্যক্রম বোঝায়। ১৯৮০ সাল থেকে এই গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এর অগ্রগতি ছিল খুবই মন্থর। '৯০-এর দশকে বয়স্ক শিক্ষার ওপর আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ও উৎসাহ যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথেষ্ট সাড়া জাগে। সেই লক্ষ্যে ১৯৯০ সালের মার্চে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা' সম্মেলন, ১৯৯০ সালের মার্চে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব শিশু অধিকার' বিষয়ক সম্মেলন ও ১৯৯৩ সালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ৯টি জনবহুল দেশের 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক সম্মেলনে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০০০ সালে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। তাছাড়াও বাংলাদেশের সংবিধান মোতাবেক রাষ্ট্র সব নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করবে— এটা উল্লেখ রয়েছে।

এ অঙ্গীকারের আলোকে বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে চালু হয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (INFEP- Integrated Non-formal Education Programme)। এই ইনফেপ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল দেশব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি অবকাঠামো সৃষ্টি করা। এই প্রকল্পের কার্যক্রম ১৯৯১ সালে শুরু হয়ে ১৯৯৭ সালে শেষ হয়। এই প্রকল্পের অভাবিত সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার স্থায়ী কাঠামো হিসেবে ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর সৃষ্টি করে।

এই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের ভৌত অবকাঠামো, জনবল ও কার্যক্রম বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় সম্প্রসারিত হয়। এই কার্যক্রমে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা সম্পৃক্ত হয় এবং আর্থিক যোগান দেয় বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন সংস্থা (বিশ্বব্যাংক, এডিবি, ডিএফআইডি, নোরাড, সিডা ইত্যাদি)। এ অধিদফতরের প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে বিভিন্ন শাখার মারফত অধিদফতরের কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। এ অধিদফতর ১৯৯৫-২০০০ সাল পর্যন্ত মোট ৪টি প্রকল্প গ্রহণ করে এবং বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পি.পি (Project Proforma) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হতে থাকে। এ অধিদফতরের প্রধানত ৪টি উইং যথা— (১) প্রশাসন ও অর্থ, (২) পরিকল্পনা, (৩) বাস্তবায়ন এবং (৪) কারিগরি সহযোগিতা উইং। আবার ওই উইংয়ের বেশকিছু শাখাও রয়েছে। এ অধিদফতরের অধীনে জেলা পর্যায়ে জেলা কো-অর্ডিনেটররা জেলা অফিসের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্য সম্পাদন করে। এ অধিদফতরের সাফল্যের একটি চিত্র সারণী-২ এ দেখানো হয়েছে।

এ অধিদফতর পরে ব্যুরো নাম সংযোজন করে নিম্নস্থ জায়গায় ২০০১ সালে মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প ১, ২, ৩ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে শুরু করে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য নব্য সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচির মাধ্যমে মানবসম্পদে উন্নীত করা। এই প্রকল্পের সফলতার একটি চিত্র সারণী-৩ এ প্রদর্শন করা হল।

মানব উন্নয়ন বলতে কর্মক্ষম মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্ঞান, দক্ষতা ও সফলতা বৃদ্ধিকে বোঝায়। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, 'It is a process of increasing knowledge, skill and capacity of a people in the society'. এই মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান উপায় হল— শিক্ষা সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রশিক্ষণ।

প্রকল্পগুলোর সফলতার চিত্র

ইনফেপ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রকল্পের মেয়াদ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১৯৯১ সাল	১৬.৬৮ লাখ	২৪.৬৯ লাখ

২য় পর্যায় : সারণী-২ : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের মেয়াদ ও লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	লক্ষ্যমাত্রা
প্রকল্প-১	১৯৯৬-২০০১	২৯.৬১ লাখ
প্রকল্প-২	১৯৯৫-২০০২	৮১.৭৯ লাখ
প্রকল্প-৩	১৯৯৬-২০০৩	৩.৫১ লাখ
প্রকল্প-৪	১৯৯৬-২০০৩	২২৮.৮৯ লাখ

৩য় পর্যায় : সারণী-৩ : পিএলসিএইচডি-প্রকল্পের মেয়াদ ও লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	লক্ষ্যমাত্রা
পি.এল.সি.ই.এইচ. ডি-১	২০০১-২০০৫	১৬.৫৬ লাখ
পি.এল.সি.ই.এইচ. ডি-২	২০০২-২০০৭	১৬ লাখ
পি.এল.সি.ই.এইচ. ডি-৩	—	০.০০৬৩ লাখ

উৎস : বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০২-২০০৩, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর, ঢাকা

উপরোক্ত প্রকল্পগুলোতে পরিলক্ষিত হয় যে, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়াও সাক্ষরতা কর্মসূচিতে বাস্তবায়নের সঠিক তথ্য উপস্থাপন করা হয়নি। বিশেষ করে টিএলএম প্রকল্পের ব্যর্থতার গ্লানির জন্য এক সময় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। অতঃপর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরিও হারাতে হয়েছিল। পরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো নাম দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে টিকিয়ে রেখে কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে চাকরিতে বহাল রাখা হয় এবং পরে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়। জানা যায়, আজও ১০৫ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকরি অঙ্গীকৃত হয়নি।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম 'শিক্ষাকে জাতীয় নীতি' হিসেবে গ্রহণ করে। শিক্ষা ও দক্ষতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর হয়েছে। নব্য শিক্ষিত জনগোষ্ঠী কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। জার্মান, ফ্রান্স, কোরিয়া মালয়েশিয়াসহ বিশ্বে প্রায় সব উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে।

সারাবিশ্বে আজ প্রায় ১২ কোটি শিশু ও ৮০ কোটি নিরক্ষর রয়েছে। তাই নিরক্ষরতা দূরীকরণ একটি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। সেই লক্ষ্যে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিকভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নের ব্যাপারে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। প্রতি বছর জাতিসংঘ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের মাত্রা পরিমাপ করে এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের অবস্থার নির্দেশ করে মানবসম্পদ উন্নয়নসূচক বের করে থাকে (Human Development Index)। সূচক প্রধানত শিক্ষার হার, মাথাপিছু আয় ও গড় আয়ুর ভিত্তিতে প্রণীত। ওই পরিমাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ১৫০তম।

আন্তর্জাতিক কর্মসূচি হিসেবে ১৮০টি দেশ 'Global Campaign for Education'-এর নানাবিধ কর্মসূচি পালন করে এবং Global Action Week-পালন করে। তাছাড়াও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, জাতিসংঘ সাক্ষরতা দশক প্রভৃতি কর্মসূচি যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ এই কর্মসূচির সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সাক্ষরতা পুরস্কার লাভ করেছে। বাংলাদেশ ২০০৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮.০০ মিলিয়ন নিরক্ষরকে সাক্ষর সেল প্রদান করেছে, যার ফলে বয়স্ক সাক্ষরতার হার শতকরা ৬৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে।

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে যা অত্যাবশ্যক :

১) মানব উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সেই লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে 'জাতীয় শিক্ষা নীতির' সঙ্গে সংযুক্ত করা। ২) নিরক্ষরমুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই ব্যাপকভাবে এই শিক্ষা প্রকল্প তথা, সাক্ষরতা, সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা/জীবনমুখী শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা (Literacy, Post Literacy, Continuing Education & Life Long Education)। ৩) এই শিক্ষার সফল বাস্তবায়নে ভৌত অবকাঠামো বৃদ্ধিসহ মাঠ পর্যায়েও জনবল বৃদ্ধি করা। বর্তমানে দেশে ২২৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন, যা নিঃসন্দেহে অপ্রতুল। ৪) দেশের সাক্ষর ও নব্য সাক্ষরদের জন্য সরকার প্রদত্ত ঋণ সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করা। ৫) প্রকল্পের দাতা সংস্থা/উন্নয়ন অংশীদারদের এ কাজে উৎসাহিত করা। ৬) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোসহ জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের প্রাধান্য দেয়া। ৭) তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে লাগসই প্রযুক্তির কৌশল ও ব্যবহার এই শিক্ষা প্রকল্পের বিকাশক্রমে সম্পৃক্ত করা। ৮) প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে মাঠ পর্যায়ের কমিটি পর্যন্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। ৯) শক্তিশালী মনিটরিং সেল গঠন করা ও পরিবীক্ষণসহ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। ১০) প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে অর্থের যোগান নিশ্চিত করা এবং এ ব্যাপারে সরকারের অঙ্গীকার বাঞ্ছনীয়। ১১) ব্যুরোর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্টদের দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া— যা পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে। ১২) এই প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থা— যারা প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা সফল বাস্তবায়ন করতে পারে, তাদের পুরস্কৃত করা। ১৩) মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা। ১৪) পরিশেষে, ২০০৬ সালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত NFE- Policy Frame Work বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল মোত্তালিব : *অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ*

সংবাদ
তারিখ 19 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৫